সোভিয়েত
ইউনিয়নের
বৈমানিক-মহাকাশচর

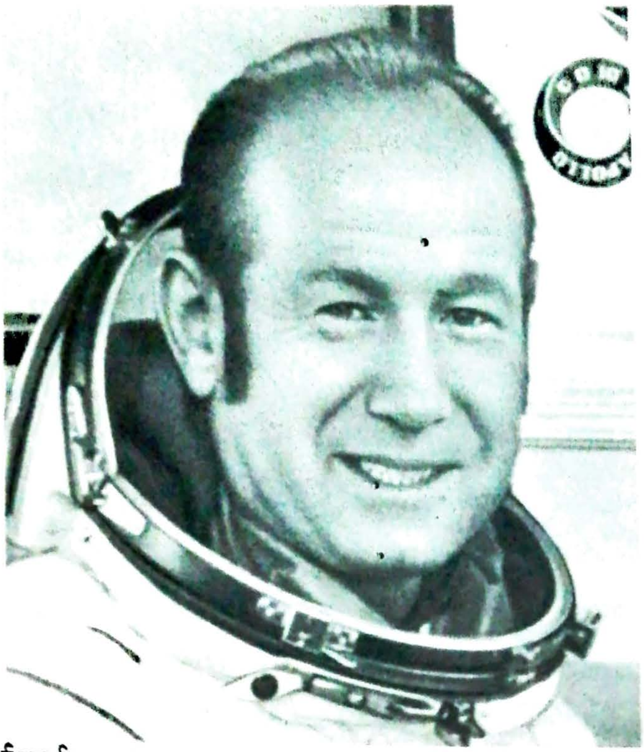
আলেক্সেই লেওনভ

'অ্যাপলো'-'সয়ুজ'
মহাকাশ অভিযানের
কাহিনী



মহাকাশে বৈঠক

প্রগতি প্রকাশন



প্রিয় কিশোর বন্ধু!

তোমার হাতের এই বইখানি লেখা হয়েছে বিশেষ করে তোমারই জন্যে। তোমারই জন্যে আঁকা হয়েছে তার ছবিগুলো। জানি না, কী তোমার নাম, কত তোমার বয়স। তবে আমি জানি যে তুমি আমার বন্ধু। আর মানুষের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বের চেয়ে মহৎ আর কী হতে পারে?

আমার বিশ্বাস, তোমার সম্বন্ধে অনেক ভাল কথাই আমি শুনতে পাব। তুমি যে আমাদের ভবিষ্যৎ, আর ভবিষ্যৎ সর্বদাই সুন্দর। তাই আজ তোমার কথা বেশি বেশি জানতে ইচ্ছে করছে আমার, এবং নিজের তরফ থেকে তোমাকেও বলতে চাই আমার বন্ধুদের কথা — সোভিয়েত আর মার্কিন মহাকাশচরদের কথা। তুমিও হয়তো মহাকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখছ? তাহলে 'সয়ুজ' ও 'অ্যাপলো' মহাকাশযান দু'টির যৌথ উড্ডয়ন-অভিযানের প্রস্তুতি কীভাবে হল ও অভিযানটি কেমন চলল সেকথা শুনতে তোমার ভাল লাগবে নিশ্চয়ই। তবে এসো, আগে আমাদের আলাপ হয়ে যাক। নাম আমার — আলেক্সেই লেওনভ্, আমি — সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈমানিক-মহাকাশচর। আর তোমার নাম কী? এই যে এখানেই তোমার নামটি লিখে ফেল।

বেশ, আলাপের পালা এবার শেষ। এখন তোমাকে বলতে পারি যে মহাকাশ থেকে তোমাকে আমি দেখেছি। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? ভাবছ, আমি মজাক করছি? মোটেই নয়, আমরা মহাকাশচরেরা ওড়ার সময় মহাকাশ থেকে দেখতে পাই নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, দেশ-মহাদেশ। দেখতে পাই শস্যে ভরা মাঠ, সবুজ বন-জঙ্গল আর ধুধু করা মরুভূমি। এমনকি চিনতে পারি বড় বড় শহর। যেমন, আমাদের রাজধানী মস্কোর কথাই ধর না। রাত্তিরে সে কী সুন্দর! বিশেষ করে উঁচু থেকে দেখলে। নিচে শুধু আলো, আলো আর আলো, যেন আলোর সীমাহীন এক সমুদ্র। নিওনের বহুরঙা বিজ্ঞাপনের ঝকমকানি দেখে মনে হয় যেন ওখানে রয়েছে বিরাট এক অগ্নিকুণ্ড, ধিকি ধিকি জ্বলছে তার লাল টকটকে কয়লা। এই সবকিছুই বড়ো জীবন্ত, বড়ো প্রাণপূর্ণ, তা আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে, হাসে ও পরে ডুবে যায় অনন্ত অন্ধকারে।

আমার বন্ধুদের যারাই মহাকাশে গেছে, সবাই তারা খুব মুগ্ধ হয়েছে এই সবকিছু দেখে:

— কী সুন্দর আমাদের ওই নীল পৃথিবীটা!

তুমি জান, কেন আমরা এ রকম বলি? কারণ এই পৃথিবীতেই তুমি মানুষ হচ্ছ। মহাকাশ থেকে আমরা তোমাকে দেখতে পাই, তোমার হাসি আমাদের সাহায্য করে সেই অতল গভীরে, যেখানে শুরু নেই, শেষ নেই, নেই ওপর, নেই তল। আমরা জানি, আমাদের প্রতিটি অভিযানের খবরাখবর তুমি রাখ। সময়-সময় আমাদের মনে হয়, মহাকাশযানে তুমিও রয়েছ আমাদের সঙ্গে, এবং সেই জন্যেই আমরা চেষ্টা করি, অভিযানগুলি যেন ভালভাবে চলে।

'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' অভিযান

'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' অভিযান কথাটি তুমি নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। তবে আসলে তা কী সে বিষয়ে তোমার হয়তো কোন স্পষ্ট ধারণা নেই।

বুঝিয়ে বলছি। অভিযানটির পুরো নাম — 'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' গবেষণামূলক যৌথ মহাকাশ অভিযান।

১৯৭৫ সালের ১৫ই জুলাই বিকাল ৩টা ২০ মিনিটে [মস্কো সময় অনুসারে] সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইকোনুর মহাকাশ ঘাঁটি থেকে যাত্রা শুরু করে 'সয়ুজ-১৯' মহাকাশযান। তাতে ছিলাম আমরা দু'জন — আমার বন্ধু ভালেরি কুবাসভ আর আমি। সাড়ে সাত ঘণ্টা পরে, রাত ১০টা ৫০ মিনিটের সময় — মস্কোয় তখন রাত, আর আমেরিকায় সবে বিকেল — কানাভেরাল অন্তরীপ থেকে যাত্রা শুরু করে মার্কিন মহাকাশযান 'অ্যাপলো'। এর ভেতরে ছিল আমাদের আমেরিকান বন্ধুরা — টমাস স্ট্যাফোর্ড, ভ্যান্স ব্রান্ড ও ডনাল্ড স্লেইটন। ১৯৭৫ সালের ১৭ই জুলাই মার্কিন মহাকাশযানটি চলে আসে সোভিয়েত মহাকাশযানের কাছাকাছি, এবং সেদিনই সন্ধ্যা ৭টা ১২ মিনিটে (মস্কো সময় অনুসারে) 'অ্যাপলো' ও 'সয়ুজের' সংযোজন ঘটে। সংযোজনের পরে কী হল তা-ই আমি বলব, তবে তার আগে অন্য একটি কথা বলে নিই। কথাটি হল এই যে সংযোজনের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমারই সমবয়সী এক ছেলে — নাম তার পিওতর গ্রিশিন — ফোন করল মস্কোর প্রেস-সেণ্টারে ও বলল:

— ওদের বলবেন, ওরা কামাল করে দিয়েছে!

তারপর আরও কত টেলিফোন, টেলিগ্রাম আর চিঠি। চিঠি-টেলিগ্রামের ভিড় জমে যায় মস্কো আর হিউস্টনে। তবে সংযোজনের পরে ছোট্ট মস্কোবাসী পিওতরই প্রথম টেলিফোন করেছিল। আমাদের কাজে সে সন্তুষ্ট হয়েছে জেনে আমরা সবাই খুবই আনন্দ পেলাম।



১৮ই ও ১৯শে জুলাই মিশ্রিত মার্কিন-সোভিয়েত চালকদল যৌথ গবেষণা পরিচালনা করে 'অ্যাপলো' ও 'সয়ুজে'। ১৯শে জুলাই অপরাহ্নে আমাদের মহাকাশযানগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং আবার সংযোজিত হয়। ১৯৭৫ সালের ২১শে জুলাই সোভিয়েত মহাকাশযানের অবতরণ যন্ত্রটি এসে নামে আর্কালিক শহরের ৫৪ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে, আর ২৫শে জুলাই মার্কিন মহাকাশযানটি অবতরণ করে প্রশান্ত মহাসাগরে, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ থেকে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার দূরে।

'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' কিসের জন্যে?

আমাদের অভিযানটি কেমন চলল ও তখন আমরা কী করলাম — এ সমস্তকিছু তুমি যাতে বুঝতে পার সেজন্যে আমি তোমাকে প্রথমেই বলব, কেন দরকার হল সোভিয়েত-মার্কিন গবেষণামূলক যৌথ মহাকাশ অভিযানের।

মনে কর, তোমার এক বন্ধু বিপদে পড়েছে। তখন তুমি কী করবে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার যন্ত্রণা দেখবে? না, তুমি অবশ্যই তার সাহায্যে এগিয়ে যাবে।

আজ মহাকাশে যায় শুধু সোভিয়েত আর আমেরিকান মহাকাশচরেরা। তবে তা শুধু আজ। কাল গ্রহ-নক্ষত্রে যাবে অন্যান্য দেশের মহাকাশযান। কোন এক মহাকাশযানে যদি দুর্ঘটনা ঘটে, তখন পৃথিবীর মানুষের কী করা দরকার? তুমি বলবে: একখানি উদ্ধার-যান পাঠিয়ে দিলেই হয়, যারা বিপদে পড়েছে তারা ওতে বসেই পৃথিবীতে ফিরে আসবে।

তুমি ঠিকই বলেছ, বন্ধু। সারা দুনিয়ার মানুষই ঠিক তা-ই ভাবে, কেননা সাধারণ মানুষ বাঁচতে চায় শান্তিতে, তারা চায় পরস্পরকে সাহায্য করতে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দু'টি বড় দেশ। তারা যদি মিলেমিশে শান্তিতে বাস করে তাহলে সারা দুনিয়ারই মঙ্গল, — সবাই তখন শান্তিতে থাকবে।

আর শান্তি চাই সব জাতির। আমরা — সোভিয়েত দেশের লোকেরা — ভালই জানি, যুদ্ধ মানুষকে এনে দেয় কত দুঃখ-দুর্দশা। গত যুদ্ধে একমাত্র আমাদের দেশেই নিহত হয় দুই কোটি ছেলেমেয়ে, নরনারী। আর ফ্যাশিস্টদের বাধানো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ হারায় মোট ৫ কোটি লোক।

সবকিছুই আমাদের মনে আছে। আমরা চাই না যে পৃথিবীতে আবার যুদ্ধ বাধুক, আমরা চাই না যে গোলাগুলিতে নিহত হোক নিরীহ নির্দোষ মানুষ। তবে তার মানে এ নয় যে আমরা কাউকে ভয় করি। না, আমরা কাউকে ভয় করি না। আমাদের দেশ খুব শক্তিশালী ও ধনী। কিন্তু সে-ই হচ্ছে প্রকৃত শক্তিশালী যে দুর্বলকে করে সাহায্য, আর সে-ই ধনী যে গরিবের সঙ্গে ভাগাভাগি করে তার সম্পদ।

আমরা চাই, পৃথিবীর ছোটবড় সব জাতি শান্তিতে থাকুক ও কাজ করুক, তাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে মানুষ হয়ে উঠুক, তারা স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর হোক। আমরা —



সোভিয়েত দেশের লোকেরা — চাই, পৃথিবীতে অভাব-অনটন দূর হোক এবং সব জাতি সুখে বাস করুক।

আমেরিকার সাধারণ মানুষও তা-ই চায়, তা-ই চায় অন্যান্য জাতি। বন্ধু-মহাকাশচরদের সঙ্গে আমি যখন আমেরিকায় গেলাম, ভাল করে জানতে পারলাম আমেরিকার মানুষকে। আমেরিকানরা খুবই বন্ধুভাবাপন্ন, অতিথিপরায়ণ জাতি, অমায়িক তাদের ব্যবহার। এ ব্যাপারে তারা আমাদের রুশীদের মতই। আমেরিকানরা সুখে-সাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করতে ভালবাসে। তারা খুব পরিশ্রমী জাতি। তারা সুন্দর কাজ করে, কাজে তাদের ভাল রুচিবোধ। কিন্তু তারা ছোটবেলা থেকেই টাকা-পয়সা রোজগারে অভ্যস্ত, আর আমাদের ছেলেমেয়েরা টাকা-পয়সা চেনে বড় হলে।

বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়র আর কারিগরদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। অবসর সময়ে আমরা বেড়াতে যাই কৃষক, জেলে আর কাও-বয়দের কাছে। তাদের সঙ্গে বসে আমরা গল্প করি, আলোচনা করি আমাদের দুই জনগণের মধ্যে মৈত্রীর বিষয়েও। যাদের সঙ্গেই আমাদের দেখা হয়েছে তাদের সবাই সোভিয়েত দেশ ও সোভিয়েত জনগণের খুব প্রশংসা করেছে।

মহাকাশ বিজয়ে আমরা ও আমেরিকানরা অনেক সাফল্য অর্জন করেছি। সোভিয়েত দেশই সর্বপ্রথম মহাকাশে প্রেরণ করে পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ ('স্পুৎনিক'), এবং আমাদের সোভিয়েত নাগরিক ইউরি গাগারিন হন বিশ্বের প্রথম মহাকাশচর। আর চাঁদে প্রথমে পৌঁছয় আমেরিকানরা। আমরা আর আমেরিকানরা রকেট পাঠাই শুক্র ও বুধ গ্রহে। আমরা আর আমেরিকানরা তৈরি করি বড়-বড় মহাকাশ স্টেশন, — ওগুলোতে লোকে থাকতে ও কাজ করতে পারে অনেকদিন।

মহাকাশ অভিযান আজও জটিল, ব্যয়বহুল ও বিপজ্জনক ব্যাপার। এইজন্যেই আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ একটি বোঝাপড়ায় এসেছেন, এবং তা হল — মহাকাশ বিজয়ে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করব। এরূপ পারস্পরিক সহায়তার ফলে শুধু রাশিয়ান আর আমেরিকানরাই লাভবান হবে না, লাভবান হবে দুনিয়ার সমস্ত জাতি।

এ হল একটা দিক। অন্য দিকটা হচ্ছে — মহাজাগতিক রহস্যোদ্ধার। এখানেও একসঙ্গে কাজ করা ভাল, আলাদাভাবে নয়, — কারণ ভবিষ্যতে তুমি যখন অন্যান্য গ্রহে যাবে, সেখানকার বাসিন্দাদের মোটেই জানার দরকার হবে না কে এসেছে তাদের কাছে — রুশী না আমেরিকান। আমাদের অজ্ঞাত এই প্রাণীদের কাছে আমাদের একই পরিচয় — আমরা পৃথিবীর মানুষ: সবারই দুই হাত ও দুই পা, দুই চোখ ও দুই কান, এক মুখ ও এক নাক। তাই নয় কি?

পৃথিবী-সান্নিধ্য কক্ষে যদি কয়েকটি স্টেশন-কারখানা নির্মাণ করা যায় তাহলে সারা মানবজাতির কী উপকারটাই না হবে! এই সমস্ত স্টেশন-কারখানায় তৈরি করা যাবে মানুষের প্রয়োজনীয় এমন বহু জিনিস, যা পৃথিবীতে তৈরি করা সম্ভব নয়, কেননা এখানে রয়েছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। তবে এরূপ স্টেশন-কারখানা গড়ার জন্যে চাই অনেকগুলি দেশের সম্মিলিত প্রয়াস। এর সঙ্গে যোগ কর আবহাওয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তৈল, কয়লা, লৌহ আকরিক ইত্যাদি মূল্যবান খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান কার্য, যোগ কর আমাদের পরিবেশ প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে মহাকাশ থেকে পর্যবেক্ষণ এবং আরও কতকিছু যার কোন ইয়ত্তা নেই। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া এইসব কাজ সম্পূর্ণ অসম্ভব...

এক কথায়, ঝগড়া-ঝাঁটি করে থাকার চেয়ে শান্তিতে বসবাস করার কারণই মানুষের বেশি।

মহাকাশ হচ্ছে এমন অন্যতম ক্ষেত্র যেখানে মানুষের রয়েছে একসঙ্গে কাজ করার মত সুযোগ। এই জন্যেই দরকার হয়েছে 'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' মহাকাশ অভিযানের এবং এই জন্যেই সোভিয়েত ও মার্কিন জনগণ সারা দুনিয়াকে দেখাতে চেয়েছে সফল সহযোগিতার উদাহরণ — মিলেমিশে থাকলে আমরা কী বিপুল সাফল্য অর্জন করতে পারি!

কীভাবে তৈরি হয় মহাকাশযান

গবেষণামূলক যৌথ মহাকাশ অভিযান কর্মসূচির জন্যে সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা বেছে নেন দু'টি মহাকাশযান — 'সয়ুজ' ও 'অ্যাপলো'। গবেষণামূলক যৌথ মহাকাশ অভিযানের কর্মসূচি অনুসারে 'অ্যাপলোর' কাজ ছিল 'সয়ুজকে' খুঁজে পাওয়া ও তার কাছে যাওয়া, তাই তাকে নাম দেওয়া হল 'সক্রিয় মহাকাশযান', আর 'সয়ুজকে' নাম দেওয়া হল 'অক্রিয় মহাকাশযান', কারণ তার কাজ ছিল আপন কক্ষে 'অ্যাপলোর' অপেক্ষা করা। যৌথ অভিযানের জন্যে আমেরিকানরা যদি 'জেমিনি' মহাকাশযান (এর জ্বালানি ধারণের ক্ষমতা 'সয়ুজের' চেয়ে কম) প্রেরণের প্রস্তাব তুলত তাহলে কক্ষপথে প্রথমে 'জেমিনিকেই' পৌঁছে দেওয়া হত ও তখন আমরা তাকে বলতাম 'অক্রিয় মহাকাশযান'। তার পিছু পিছু যাত্রা শুরু করত 'সয়ুজ' ও মহাকাশে সে 'জেমিনিকে' খুঁজে বের করত, ফলে সে হত 'সক্রিয় মহাকাশযান'।

তবে মহাকাশযানের নাম নিয়ে আসল অসুবিধা নয়: নাম যাই হোক উভয় ক্ষেত্রেই দুই মহাকাশযানের চালকদলের পক্ষে যা সবচেয়ে জরুরি ছিল তা হল বিপুল জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা যাতে মহাকাশে সংযোজন সফল হয়। অভিযান কর্মসূচিতে এমনকি এরূপ নির্দেশও ছিল: এক মহাকাশযান থেকে অপর মহাকাশযানে আসা-যাওয়া করার সময় যদি কোন শঙ্কাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে 'সয়ুজ' ও 'অ্যাপলোর' চালকবৃন্দ নিজ নিজ জায়গায়ই অবস্থান করবে (অর্থাৎ বিপদ দেখা দেওয়ার সময় যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে) এবং মহাকাশযানদ্বয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে চালকদের নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে পৃথিবীতে অবতরণ করবে। ধর, আমি রয়েছি 'অ্যাপলোতে', এমন সময় বিপদ দেখা দিল, তখন আমি 'অ্যাপলোতে' করেই নামতে পারতাম প্রশান্ত মহাসাগরে, আর টমাস স্ট্যাফোর্ড এমতাবস্থায় 'সয়ুজে' করে অবতরণ করত আর্কালিক শহরের কাছে।

তুমি অবশ্য জান যে মহাকাশে শঙ্কাজনক কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নি এবং 'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' মহাকাশ অভিযানের কর্মসূচিটি আমরা পুরোপুরিভাবেই সম্পাদন করেছি।

মহাকাশযানের প্রস্তুতিতে প্রধান অসুবিধাটি ছিল মহাকাশচরদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা নিয়ে, কেননা আমরা আর আমেরিকানরা শ্বাস নিতাম বিভিন্ন বাতাসে। 'আমাদের মহাকাশযানে মহাকাশচররা শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায় সাধারণ চাপমাত্রায় সাধারণ বাতাসে, যেন একেবারে অবিকল সমুদ্রতীরের হাওয়ায়। আর আমেরিকানরা নিজেদের মহাকাশযানে সে কাজ সম্পন্ন করে সেমি-সলিড অক্সিজেনের সাহায্যে। ব্যাপারটা হল এই যে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ও মার্কিন পদ্ধতি অদ্যাবধি বিকশিত হয়েছে পৃথক-পৃথকভাবে, এবং আমেরিকানরা প্রথম দিকে তাদের মহাকাশযানগুলিকে খুবই হালকা করতে চেষ্টা করে। তাই তারা স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তে সেমি সলিড অক্সিজেনের আশ্রয় নেয়। ওজনে আমেরিকানরা দাঁও মারল বটে, তবে অম্লজান কিন্তু একদিক দিয়ে বিপজ্জনক: সামান্য স্ফুলিঙ্গেই মহাকাশযানের ভেতরকার সমস্তকিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে।

তাছাড়া আরও একটি অসুবিধা ছিল। তা হল — এক মহাকাশযান থেকে অন্য মহাকাশযানে যাওয়ার সময় বায়ুমণ্ডলের তীব্র পরিবর্তন হেতু সম্ভাব্য জখমের হাত থেকে মহাকাশচরদের কীভাবে নিজেদের রক্ষা করতে হবে? প্রথমে মনে হল, 'অ্যাপলোর' বায়ুমণ্ডলকে বদলে ঠিক 'সয়ুজের' বায়ুমণ্ডলের মত করে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু তা করতে গেলে 'অ্যাপলোর' ভেতরে চাপমাত্রা বাড়াতে হত, আর এর ফলে দুর্বল হয়ে পড়ত মহাকাশযানের খোল। দুর্বল খোলের মহাকাশযানে অন্তরিক্ষ অভিযান খুবই বিপজ্জনক। মহাকাশযান দু'টির মধ্যে অবশ্য একটি ট্রান্সিশনেল স্লুজ (অতিক্রমণ নলিকা) বসানো যেত, এবং তারপর মহাকাশচরকে সেই স্লুজের ভেতরে গিয়ে আটটি ঘণ্টা কাটালেই সব ঝামেলা যেত মিটে, — মানুষের রক্তে যে-দ্রবীভূত নাইট্রোজেন থাকে তা পুরোপুরিভাবে উবে যেতে ঠিক আট ঘণ্টা সময়ই লাগে। তবে স্লুজে আবার দু'টি অসুবিধা। প্রথমত, সুদীর্ঘ আটটি ঘণ্টা স্লুজে বসে থাকা অত্যন্ত ক্লান্তিকর, দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে যদি কোন মহাকাশযান দুর্ঘটনায় পতিত হয়, তখন কী হবে? অন্য মহাকাশযান অবশ্যই তার সাহায্যে ছুটে যাবে, কিন্তু তখন আট ঘণ্টা তো দূরে থাক, ত্রাণকার্যের জন্যে এমনকি কয়েকটি মিনিটও অপেক্ষা করা যাবে না।

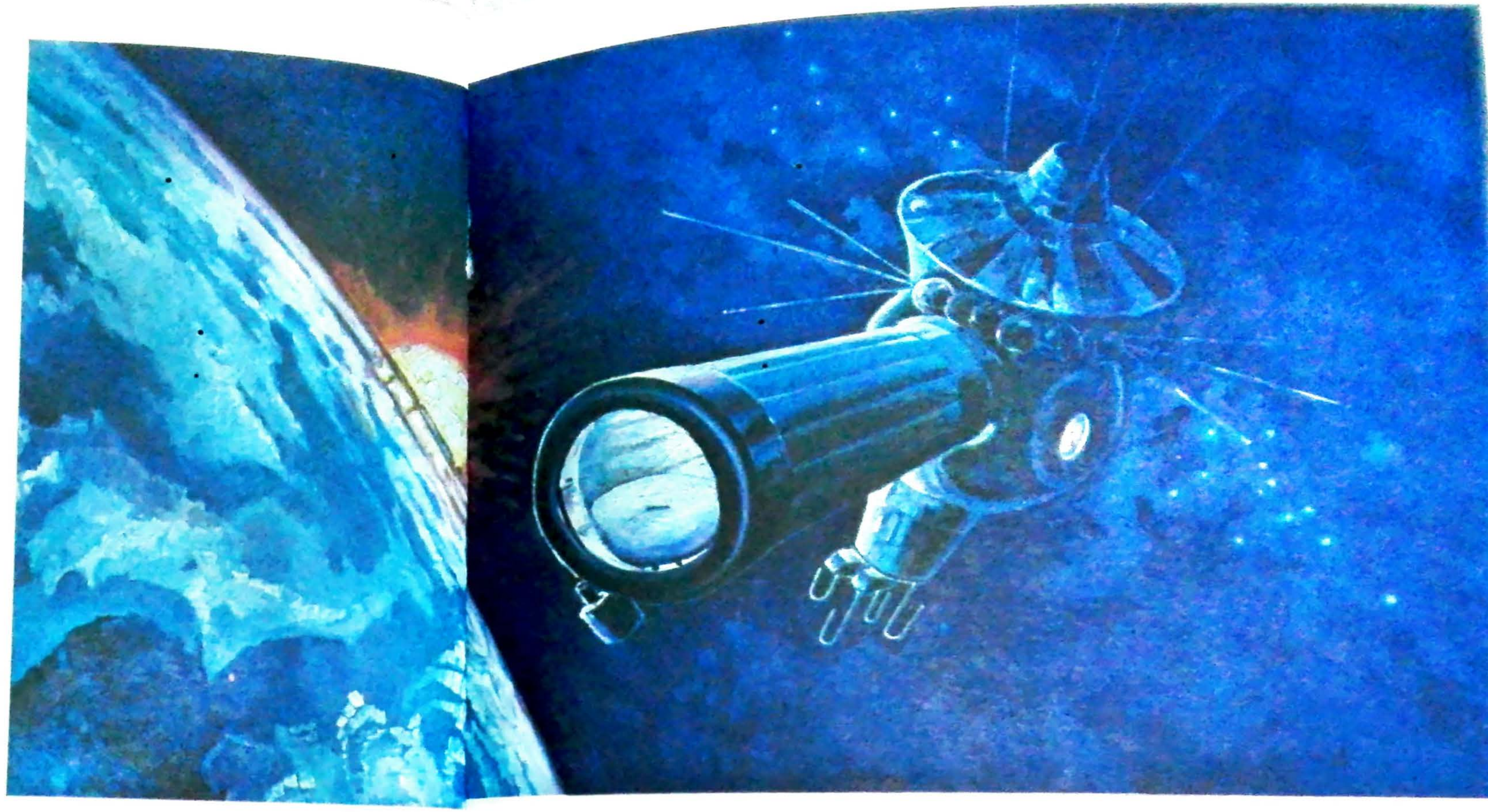
আরও একটি উপায় ছিল। তা হল স্লুজের কথা ভুলে যাওয়া এবং সোভিয়েত ও মার্কিন মহাকাশচরদের একই মহাজাগতিক পোশাক পরিয়ে দেওয়া, —১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে 'ভসখোদ-২' মহাকাশযানে উড্ডয়নের সময় যে পোশাক পরে আমি খোলা মহাকাশে বেরিয়েছিলাম এই পোশাকটিও হবে অনেকটা সে রকমই। পোশাকটি খুবই

আরামের, খোলা মহাকাশের পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবে বাস ও কাজ করার জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত সুবিধাই তাতে আছে। তবে খোলা মহাকাশে যা ভাল, মহাকাশযানের ভেতরেও যে তা হামেশা ভাল হবে এমন কোন কথা নেই, — এরূপ পোশাক পরে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে খুব একটা আলাপ-সালাপ করা যায় না। এমনকি মামুলি কথাও তখন বলতে হবে বেতারে।

এই জটিল সমস্যা সমাধানেরও একটি উপায় খুঁজে পেলেন বিজ্ঞানীরা। এর জন্যে তাঁরা কমিয়ে দিলেন 'সয়ুজের' অভ্যন্তরীণ চাপমাত্রা, আর মহাকাশচরেরা যাতে নিদ্রাবেশে অভিভূত না হয় সেজন্যে অক্সিজেনের পরিমাণ দিলেন বাড়িয়ে। 'সয়ুজের' ভেতরের চাপমাত্রা এখন আর সমুদ্রতীরের চাপমাত্রার মত নয়, তা ৩,০০০ মিটার উঁচু পর্বতচূড়ার চাপমাত্রার সমান, তবে তাতে অক্সিজেনের পরিমাণ কিন্তু সমুদ্রতীরের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি। এবার নির্ভয়ে এক মহাকাশযান থেকে অন্য মহাকাশযানে আসা-যাওয়া করা যাবে, কারণ মহাকাশচরদের রক্তে নাইট্রোজেন 'টগবগ করে ফুটতে শুরু করবে' বলে যে ভয় ছিল তা আর নেই।

তবে বন্ধু, এখানেও কিন্তু আমাদের 'দুর্গতির' শেষ হল না। তুমি-আমি জানি, কোন্ মহাকাশযান মহড়া চালাবে মহাকাশে, আর কোন্‌টি — মহড়া সমাপ্তির অপেক্ষা করবে। আমরা এও জানি, সংকট দেখা দিলে কাকে কোথায় থাকতে ও পৃথিবীর কোন্ অংশে অবতরণ করতে হবে। আমরা আরও জানি, এক মহাকাশযান থেকে অন্য মহাকাশযানে বেড়াতে যেতে হলে মহাকাশযান দু'টির বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে কীরূপ 'আচরণ' করা দরকার। কিন্তু পরস্পরের কাছে যাওয়া-আসা করার জন্যে কী ধরনের ব্যবস্থা থাকা চাই?

সর্বাগ্রে বলব যে আমাদের ও আমেরিকানদের মহাকাশযানে প্রবেশ ও তা থেকে নির্গমের জন্যে ডকিং অ্যাসেম্বলি (সংযোজন গ্রন্থি) কখনই এক ধরনের ছিল না। যেমন, আমাদের মহাকাশযানে রয়েছে নিজস্ব ডকিং অ্যাসেম্বলি, যার মধ্য দিয়ে 'সয়ুজ' মহাকাশযান থেকে যাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক কক্ষ-স্টেশন 'সালুত'-এ, আর আমেরিকানদের — ভিন্ন ডকিং অ্যাসেম্বলি, তার মধ্য দিয়ে তারা পরিবহন-যান থেকে গেছে 'স্কাইল্যাব' স্টেশনে। এই ডকিং অ্যাসেম্বলিগুলির প্রতিটি নিজ নিজ মহাকাশযানেরই উপযোগী, তবে 'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' অভিযান কর্মসূচির পক্ষে তা ছিল সম্পূর্ণ অকেজো। তখন ডকিং অ্যাসেম্বলি ও ট্রান্সিশনেল স্লুজ গড়ার ভার নিলেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা।



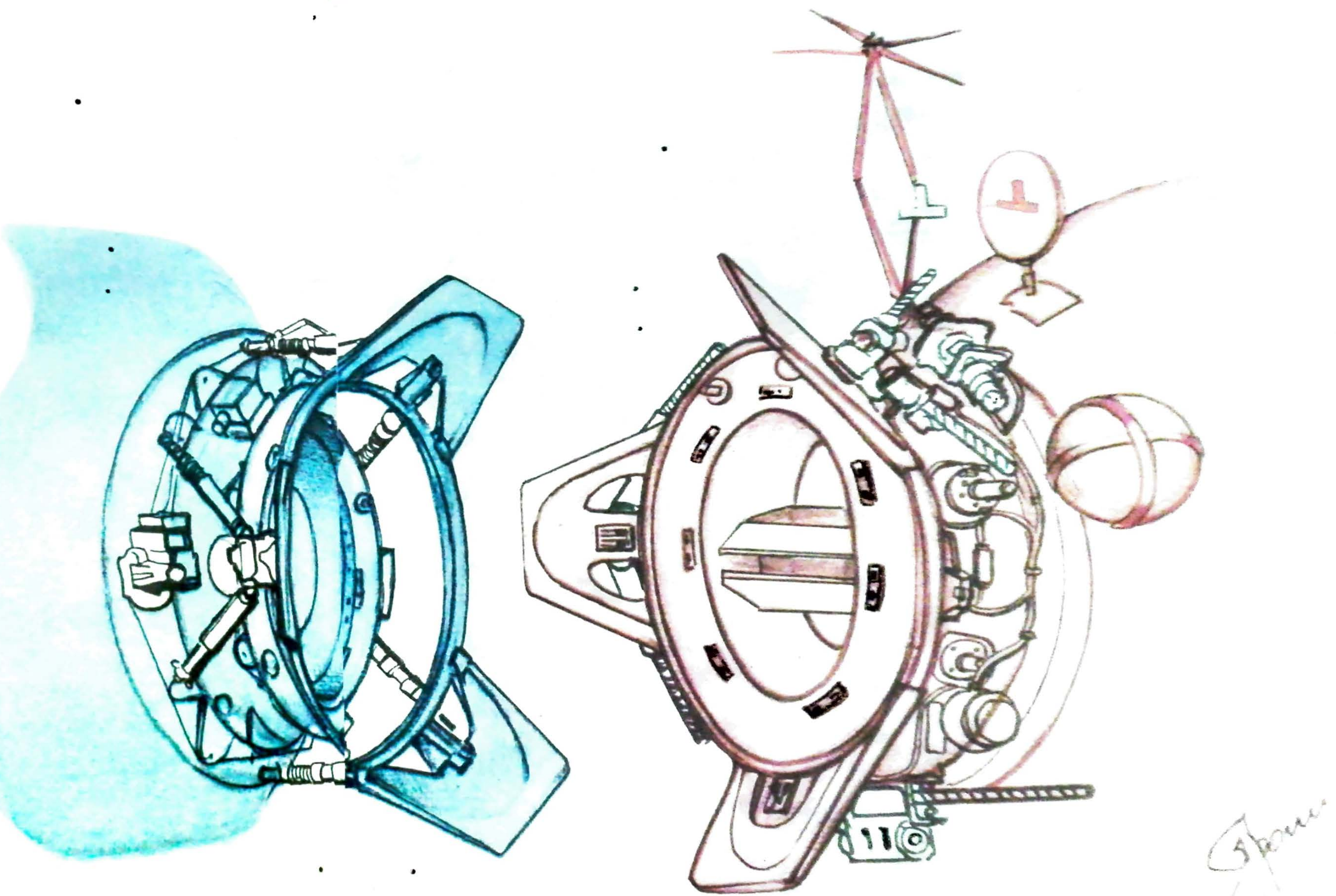
মহাকাশযান 'ভসখে

আর সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এদিকে মন দিলেন 'সয়ুজের' অভ্যন্তরীণ বায়ুমণ্ডল 'গড়ার' কাজে, তাকে তাঁরা খাপ খাওয়াতে লাগলেন 'অ্যাপলোর' বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে।

ডকিং অ্যাসেমব্লির নক্সা বানানো হল বটে, তবে দেখা দিল নতুন এক সমস্যা: মহাকাশযান দু'টি খাড়াভাবে না এসে যদি সামান্যও তেরচাভাবে পরস্পরের নিকটস্থ হয় তাহলে কী করা? তখন ডকিং অ্যাসেমব্লি যে কাজই করবে না! তাছাড়া আরও এক ঝঞ্ঝাট: 'সয়ুজ' আর 'অ্যাপলো' মহাকাশযান দু'টির ওজন এক নয়। তারা যদি এমনকি খাড়াভাবেও নিকটস্থ হয়, তাহলে মহাকাশে তাদের আচরণ কেমন হবে?

এক কথায়, ঝামেলা ছিল মেলা। সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীদের প্রচুর খাটতে হয়েছে এবং তাঁরা খেটেছেন খুব মিলেমিশে। তাঁরা সাহায্য করেছেন পরস্পরকে, একসঙ্গে ভেবেছেন, প্রকৃতির ওপর 'বাটপাড়ি করে' কীভাবে এমন এক ডকিং অ্যাসেমব্লি গড়া যায় যা যেকোন পরিস্থিতিতেই ভাল কাজ করবে, তাঁরা একসঙ্গে খুঁজেছেন কক্ষপথ যেখানে 'সয়ুজ' আর 'অ্যাপলোর' মিলন ঘটানো যাবে সবচেয়ে সহজে এবং তখন মহাকাশযান দু'টি পরিণত হবে দুই ঘরের একটি বাড়িতে ও মহাকাশচরেরা অনায়াসে পরস্পরের কাছে বেড়াতে যেতে পারবে। তবে এই বাড়ির দুই ঘরের মধ্যে চলাফেরার কোন উঠোন ছিল না; উঠোনের বদলে বিজ্ঞানীরা আমাদের জন্যে তৈরি করে দেন ৩·২ মিটার দৈর্ঘ্য ও দুই মিটারের চেয়ে সামান্য কম ব্যাসের একটি সংযোজন পথ — ডকিং মডিউল। এরই ভেতর দিয়ে আমরা যাওয়া-আসা করতাম এক মহাকাশযান থেকে অন্য মহাকাশযানে।

বেশ মজার ব্যাপার, তাই না? তুমি কী বল?



মহাকাশ অভিযানের প্রস্তুতি

প্রতিটি মহাকাশ অভিযানই এক একটি বিরাট ব্যাপার — তাতে অংশ নেয় শত-শত, আর কখনও হাজার-হাজার বড়-বড় বৈজ্ঞানিক ও উৎপাদনী কর্মিদল। বস্তুত, মহাকাশ অভিযানের প্রস্তুতি ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে সারা দেশ, আর 'সয়ুজ'-'অ্যাপলো' যৌথ অভিযানের প্রস্তুতি ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেছে একই সঙ্গে দু'টি দেশ। মহাকাশচরদের ওপর খুব আস্থা রাখা হয়, এবং তাদের সে-আস্থা রক্ষা করা চাই। নিজ কাজ এবং গোটা অভিযান কর্মসূচি সম্বন্ধে মহাকাশচরের থাকা চাই চমৎকার জ্ঞান, আপন অস্তিত্বের সর্বশক্তি দিয়ে তাকে অনুভব করতে পারা চাই, তার অপর সাথী কী করছে, দরকার হলে সর্বদা এগিয়ে যেতে হবে তার সাহায্যে। অভিযানের সঙ্গীকে আপন অস্তিত্বের দ্বিতীয়াংশের মতই অনুভব করার ক্ষমতা থাকা চাই মহাকাশচরের।

তাছাড়া মহাকাশচরকে হতে হয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, জটিলতম পরিস্থিতিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হয়ে তাকে স্থির থাকা চাই এবং খুঁজে বের করতে পারা চাই একমাত্র সঠিক সিদ্ধান্ত। এসমস্ত গুণ নিয়ে মানুষ জন্মায় না, তা তাকে আয়ত্ত করতে হয় সুদীর্ঘ প্রয়াসে — দেহ ও মনকে গড়ার ভেতর দিয়ে।

এসো, এবার আমারই জীবনের একটি ঘটনা বলি। তখন আমি তরুণ মহাকাশচর, একবারও মহাকাশে যাই নি, তবে যাওয়ার জন্যে অবিরাম তৈরি হচ্ছিলাম। ভাবী মহাকাশচরের বাধ্যতামূলক প্রস্তুতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়: তালিম-যন্ত্রে কাজ (এরূপ যন্ত্রে তালিম নেওয়ার সময় মনে হয় তুমি যেন ঠিক মহাকাশেই রয়েছ), বিভিন্ন বিমানে উড্ডয়ন এবং প্যারাশ্যুটে অবতরণ।

প্যারাশ্যুটে করে লাফাতে আমি ভালবাসি, এবং লাফিয়েছি আমি হামেশাই — কি বিমান বাহিনীতে কাজ করার সময়, কি মহাকাশচরদের দলে আসার পর। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এ কাজে অপ্রত্যাশিত কিছুই ঘটতে পারে না। একদিন আমি তালিম নিচ্ছিলাম একটি নতুন প্যারাশ্যুটে। বিমান থেকে ধীরেসুস্থে লাফ দেওয়ার পর মনে হল প্যারাশ্যুটে যেন কোন গণ্ডগোল আছে। চেয়ে দেখি একটি ফিতে পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে আমাকে উল্টে দিয়েছে এবং আমি উপুড় হয়ে ছুটছি মাটির দিকে। বড় কষ্টে পা'টি ছাড়ালাম বটে, কিন্তু আপদ কি আর কম! পা ছাড়াতেই ফিতেটা আটকে গেল পিঠে। এবার আমি মাটির দিকে উড়ছি কাত হয়ে। সেদিন সত্যিই আমার ভীষণ ফাঁড়া গেছে। ভাববার সময় ছিল না মোটেই, প্রতিটি মুহূর্তই মহামূল্যবান। তখন একটি মাত্র উপায় — পিঠের নিচের পাশ সোজা ক'রে ফিতের ফাঁশ খুলে দেওয়ার চেষ্টা করা। যখন মাটি থেকে মাত্র তিরিশ মিটার ওপরে রয়েছি



সমস্ত শক্তি একত্র করে আমি তা-ই করলাম। ফাঁশ খুলে গেল। অবতরণের জন্যে আমি উপযুক্ত অবস্থান নিলাম।

সবদিক থেকে বন্ধুরা ছুটে এল আমার কাছে। লেওনভ আকাশে কেমন 'তামাশা করে' তা তারা দেখেছে। তাদের

রেওয়াজ মত মহাকাশযান বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় ভোর বেলা। ৪৯ মিটার দীর্ঘ আমাদের 'সয়ুজ-১৯' প্রেরণ-ক্ষেত্রে পেঁাছে ১২ই জুলাই সকাল ৭টায়।

পৃথিবীতে রকেটটি অসম্ভব সুন্দর দেখায়। তবে আমি জানি যে উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জের আলোয় উড়ন্ত মহাজাগতিক রকেট আরও বেশি সুন্দর মনে হয়।

পনেরো বছর আগে যখন যাত্রার জন্যে তৈরি হচ্ছিল ইউরি গাগারিন, এখানে — বাইকোনুর মহাকাশ ঘাঁটিতে — ধ্বনিত হয়েছিল মহান ত্সিওলকভ্স্কির কথা: 'মানবজাতি চিরদিন এই পৃথিবীর মাটিতেই থাকিবে না। তবে আলো এবং মহাশূন্যের সন্ধানে প্রথমে তাহারা ভীতচিত্তে কেবল বায়ুমণ্ডলের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইবে, আর তাহার পর জয় করিবে সৌর-সান্নিধ্য সমস্ত শূন্য দেশ'। ত্সিওলকভ্স্কির স্বপ্ন আজ সফল হচ্ছে।

বাইকোনুরে 'সয়ুজ-১৯' মহাকাশযানের যাত্রার প্রাক্কালীন প্রস্তুতি শেষ, জানা গেছে 'অ্যাপলো'ও যাত্রার জন্যে তৈরি।

— সবকিছুই ঠিক আছে, — বেতারে আমাদের বলে স্ট্যাফোর্ড।

আমেরিকায় তখন খারাপ আবহাওয়া: ঝড়-তুফান হচ্ছে খুব। বজ্রাঘাতে 'অ্যাপলোর' যাতে কোন ক্ষতি না ঘটে সেজন্যে তাকে 'লুকিয়ে ফেলা' হয় চালার নিচে।

আমাদের বাস প্রবেশ করে প্রেরণ-ক্ষেত্রে। রকেটের পাদদেশে জমেছে অসংখ্য লোক। ভালেরি আর আমি — আমরা তখন মহাজাগতিক পোশাকে সজ্জিত, তাতে মাটিতে চলাফেরায় একটু অসুবিধা হয় বৈকি, তবে মহাকাশে এ পোশাক অপরিহার্য — বাস থেকে বেরলাম। আমি ঘোষণা করলাম:

— 'সয়ুজ-১৯' মহাকাশযানের চালকদল যাত্রার জন্যে প্রস্তুত।

মহাকাশ অভিযানের সময় মহাকাশচরদের আলাদা নাম দেওয়া হয়। মহাকাশে আমার প্রথম নাম ছিল 'আলমাজ'। পরবর্তীকালেও মহাকাশচরদের সেই নামগুলি থেকে যায়। কিন্তু এবার ভালেরি আর আমার এক নাম: 'সয়ুজ'। আমেরিকানদের তা পছন্দ। আমাদের মহাকাশযানের নামও তাদের মনে ধরেছে। তারা মনে করে যে 'সয়ুজ' শব্দটিতেই নিহিত রয়েছে মহাকাশে আমাদের আসন্ন কাজের তাৎপর্যের চমৎকার ব্যাখ্যা। 'সয়ুজ' — তার মানে 'মিলন'। আমাদেরও ভাল লাগে নামটি।

লিফ্টে করে উঠি রকেটের চুড়োয়। তাকিয়ে দেখি, হাতছানি দিয়ে সবাই বিদায় জানাচ্ছে।

মহাকাশযানে নিজ নিজ জায়গায় গিয়ে বসলাম। বিপরীত গতিতে ছুটতে থাকে সময়।

চাঙ্গা মেজাজ, উল্লসিত প্রাণ। কথাবার্তা চলছে, আজ প্রতিটি ছেলেমেয়ের পরিচিত সেই আসল কথাগুলির অপেক্ষায় আমরা:

— রেডি!

— এক!

— দুই!

মহাকাশযানের ভেতরে পূর্ণ শৃঙ্খলা।

সরে পড়ে শেষ ক্যাবল-মাস্তুলটি যা রকেটকে মাটির ওপর ধরে রাখে। শোনা যায়:

— ফায়ার!

— আপ্!

ঘড়ি দেখলাম। মস্কো সময় বিকেল ৩টে ২০ মিনিট।

প্রতি সেকেণ্ডে পৃথিবী খবর দিচ্ছে উড্ডয়ন কেমন চলছে। কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট। বাড়ছে চাপ। মহাকাশযানের গতিও পাচ্ছে বৃদ্ধি। তারপর আমরা চলে গেলাম ভূ-মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাইরে।

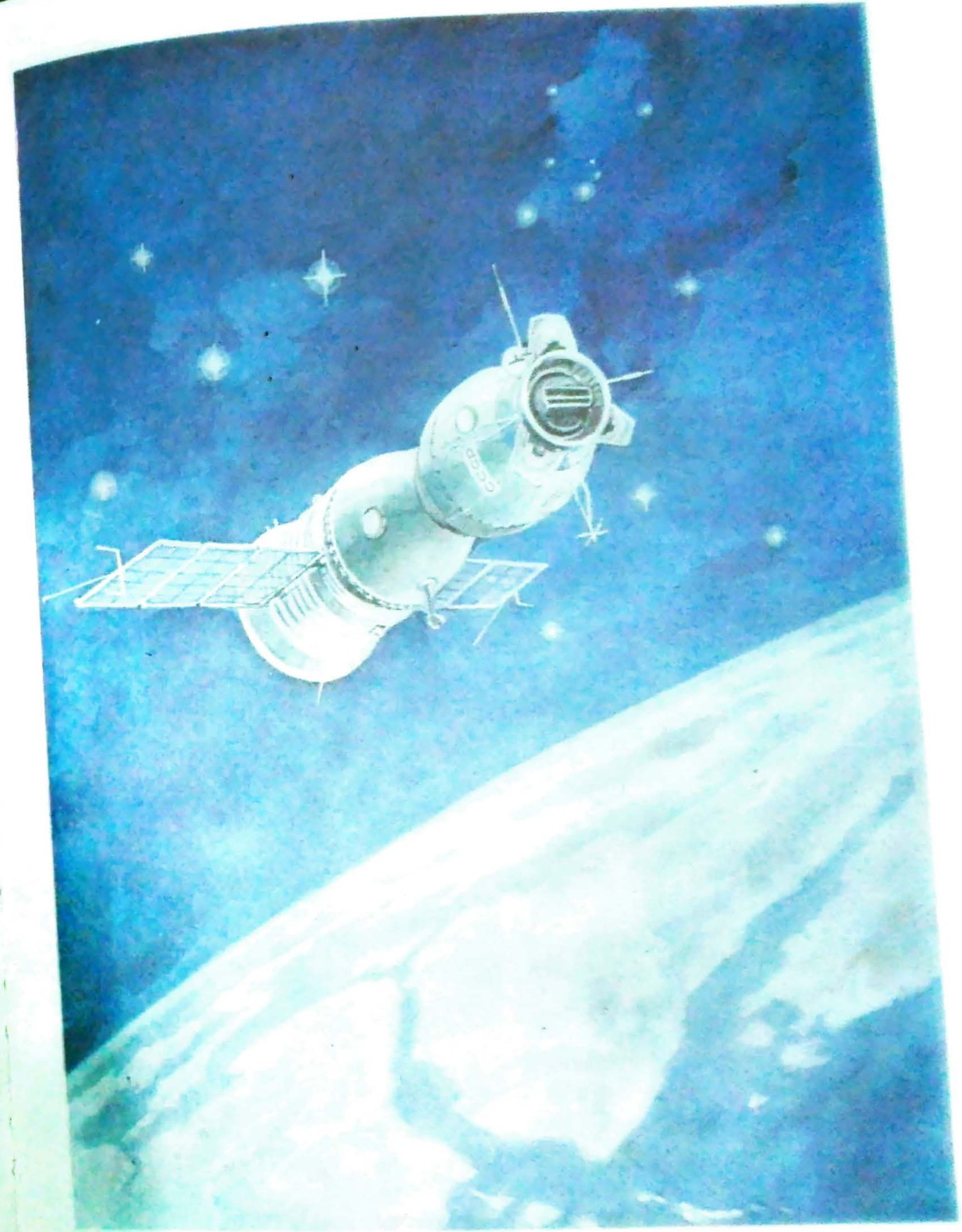
মহাকাশে পেঁাছার পর ওজন আর থাকল না। এবার শুরু হল ওজনহীনতা। টমাস স্ট্যাফোর্ড আমাদের বলে:

— শিগগিরই আমরা তোমাদের নাগাল ধরব!..

কিন্তু টেলি-কমেণ্টেটর টমাসকে থামিয়ে দেন:

— সবুর করো, অত শিগগির আর হচ্ছে না, তোমাদের আরও দু'দিন উড়তে হবে।

রাত ১০টা ৫০ মিনিটের সময় কানাভেরাল অন্তরীপ থেকে মহাকাশে যাত্রা শুরু করে 'অ্যাপলো'।



মহাকাশে 'সয়ুজ'

তারপর আমরা বেড়াতে গেলাম পরস্পরের কাছে — ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে সেটাই তো রীতি। প্রথমে আমাদের কাছে এল টমাস স্ট্যাফোর্ড আর ডনাল্ড স্লেইটন। নিজ নিজ দেশের পতাকা বিনিময় করি আমরা, একসঙ্গে বসে খাই। 'মদও' টানলাম — তবে তা আসল মদ নয় কিন্তু, বোরশ রস। ততক্ষণে ভালেরি রওনা দিল ভ্যান্স ব্রান্ডের কাছে।

মহাকাশে প্রতিটি মুহূর্তই খুব মূল্যবান। তাই খাওয়া-দাওয়া সেরে সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা যৌথ কাজে হাত দিই। আমাদের ডাকসাইটে মহাজাগতিক কালাই-মিস্ত্রি ভালেরি ডনাল্ডের সঙ্গে মিলে শুরু করল যৌথ বৈজ্ঞানিক গবেষণা — 'বহুমুখী চুল্লী'। টম আর আমি স্বাক্ষর করি মহাকাশে প্রথম আন্তর্জাতিক সংযোজন সম্পর্কিত দলিল এবং বিনিময় করি প্রতিটি চালকদল কর্তৃক নিয়ে আসা স্মৃতিচিহ্ন। পরদিন, ১৯৭৫ সালের ১৮ই জুলাই, আমি গেলাম 'অ্যাপলোয়'। সেদিন টম আর আমি পরস্পরের কাছ থেকে গ্রহণ করলাম সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় প্রতীক খোদিত দুটি স্মৃতিফলক। ফলকগুলির প্রতিটিতে ছিল মহাকাশযান দুটির সংযোজনের তারিখ।

বার বার চালকদলগুলির জায়গা বদল হওয়া সত্ত্বেও আমরা সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করতে চেষ্টা করেছি। পাঁচজনে মিলে আমরা যেন ছিলাম একটি চালকদল। প্রকৃত পক্ষে ছিলও তাই, নইলে সবকিছু করা সম্ভব হত না। আগেই আমি তোমাকে বলেছি যে আমাদের মহাজাগতিক গৃহ 'সয়ুজ'-'অ্যাপলোয়' যদি কোন মারাত্মক সঙ্কট দেখা দেয় তাহলে প্রত্যেককে যার-যার জায়গায় থাকতে হবে এবং সেই অবস্থাতেই আলাদা-আলাদাভাবে ফিরতে হবে পৃথিবীতে। আর সেই জন্যেই প্রত্যেকটি মহাকাশযান ও তার খুঁটিনাটি সমস্তকিছু আমাদের ভাল করে জানা একান্তই দরকার ছিল।

আমাদের সম্মিলিত মহাকাশ অভিযান অতি চমৎকারভাবেই সম্পন্ন হল এবং আমাদের আন্তর্জাতিক মহাজাগতিক গৃহে কোনরূপ সঙ্কটও দেখা দেয় নি।

মহাকাশ থেকে আমাদের সাংবাদিক সম্মেলনেও অংশ গ্রহণ করতে হয়। হরেক রকমের প্রশ্ন ছিল। যেমন এ ধরনের প্রশ্নও বাদ পড়ে নি: মার্কিন মহাকাশচরদের আপনারা কী খেতে দিয়েছেন আর তাঁরাই বা আপনাদের কী খাইয়েছেন?

মহাজাগতিক খাদ্য — জিনিস সম্পূর্ণ আলাদা, পৃথিবীতে আমরা যা খাই তা নয় মোটেই। এই খাদ্য তৈরি হয় বিশেষ এক পদ্ধতিতে, মহাজাগতিক খাদ্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা। কোন এক প্রাচীন দার্শনিক বলেছিলেন, 'খাবার ভাল না মন্দ তা নির্ভর করে কার সঙ্গে খাচ্ছ'। আমরা খেয়েছি আমাদের চমৎকার বন্ধুদের সঙ্গে, এবং সেটাই আসল কথা। আর খাবারের কথা বলতে গেলে বলব, তা ঠিক 'মহাজাগতিক মানেরই' খাদ্য।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে স্ট্যাফোর্ড আর আমি দৃষ্টিপাত করলাম আমাদের অদূর ভবিষ্যতে।

স্ট্যাফোর্ডকে প্রশ্ন করা হয়: 'আর কী ধরনের মহাকাশ অভিযানে আপনি আবারও অংশ নিতে চান?'

স্ট্যাফোর্ড বলে:

— হামেশাই ইচ্ছে হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক মহাকাশযানে উড়তে, নতুন অভিযানে অংশ নিতে। আমাদের 'স্পেইস শাটল' কর্মসূচি শুরু হতে আর বেশি বাকি নেই, এবং আমি অবশ্যই তাতে যোগ দিতে চাই। আশা করি, নতুন সম্মিলিত অভিযানের জন্যে আলেক্সেইও ততদিনে নতুন একটি মহাকাশযান পেয়ে যাবে। মানবজাতি প্রগতির পথ ধরে চলেছে। গড়ে উঠবে নতুন মহাজাগতিক প্রকৌশল। আমার আশা আছে, ভবিষ্যতে যৌথ অভিযানের জন্যে ব্যবহৃত হবে নতুন ও অধিকতর উৎকৃষ্ট সব মহাজাগতিক সাজসরঞ্জাম। তাতে উপকৃত হবে গোটা দুনিয়ার মানুষ।

টমের সঙ্গে আমি একমত। আমিও অবশ্য এমন কোন মহাকাশযানে উড়তে চাই যা দীর্ঘকাল ধরে প্রদক্ষিণ করবে ভূ-গোলকের চারিদিকে। তাহলে আমি শিল্পীর চোখ দিয়ে দেখতে পাব আমাদের পৃথিবীর অপরূপ চেহারা, তার বিভিন্ন রঙ। এই সমস্তকিছু স্মৃতিবদ্ধ ক'রে এনে পৌঁছে দেব পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে। এখনকার চেয়ে আরও বেশি ওপরে উড়তে চাই আমি। ওখান থেকে পৃথিবীকে দেখাবে সম্পূর্ণ অন্য রকম।

বিদায় ও প্রত্যাবর্তন

১৯শে জুলাই ভালেরি আর আমি 'সয়ুজে' নিজ নিজ জায়গা নিলাম, আর আমাদের আমেরিকান বন্ধুরা — 'অ্যাপলোয়'। আমাদের মহাকাশযানে আমরা বায়ুচাপ বাড়ালাম এবং অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে নিয়ে এলাম স্বাভাবিক পর্যায়ে।

পৃথিবীতে থাকতে আমরা মার্কিন বিজ্ঞানীদের অনুরোধ করেছিলাম তাঁরা যেন আমাদের আরও একটি যৌথ বৈজ্ঞানিক গবেষণা — কৃত্রিম সূর্যগ্রহণ ঘটানোর সম্মতি দেন। সম্মতি পেয়েছিলাম।

আমাদের পৃথিবী থেকে যে সূর্যগ্রহণ দেখা যায় তা থেকে সর্বদা পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না। সূর্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পেতে বাধা দেয় পৃথিবীতে অহরহ ঘটমান বায়ুমণ্ডলীয় পরিবর্তন। মহাকাশে ব্যাপার আলাদা। ওখানে সূর্যগ্রহণ নিরীক্ষণ করতে কিছুই বাধা দেয় না। তাই আমরা যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ ক'রে আনি তা বহু বিজ্ঞানীকেই আকৃষ্ট করে।

সেদিনই আনাতোলি ফিলিপচেঙ্কো ও নিকোলাই রুকাভিশনিকভের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ জুটে যায় আমাদের।

— 'সয়ুজ', শুনতে পাচ্ছ? আমি ফিলিপচেঙ্কো। কী খবর তোমাদের?

বন্ধুর গলা শুনে আমি খুশি।

— আপাততঃ সবকিছুই ঠিকঠাক।

— আমার মনে হয়, এর পরেও সবকিছু ঠিক চলবে। তোমাদের পরিবারের তরফ থেকে তোমাদের জন্যে অনেক শুভেচ্ছা। সবাই চিন্তিত। তোমাদের পথ চেয়ে বসে আছে।

ভালেরি — নিজের মিতকাকে ছেড়ে যে একদিনও বাঁচতে পারে না — রাগের ভান করে বলে:

— চিন্তা করার আবার কী আছে? আমাদের সবকিছুই ঠিক চলছে।

— আমাদের আমেরিকান বন্ধুরা কেমন?

— এখনও ঘুমোচ্ছে, — বলে ভালেরি। — কাল সারাদিন ভীষণ খাটুনি গেছে।

— ওদেরও জানাবে আমাদের শুভেচ্ছা, — বলে আনাতোলি, আর নিকোলাই যোগ করে:

— পৃথিবীতে দেখা হবে, খুব অপেক্ষা করছি কিন্তু!

১৯শে জুলাই বিকেল তিনটের সময় শুরু হল 'সয়ুজ' ও 'অ্যাপলোর' বিয়োজন। আমেরিকান বন্ধুরা দিক নির্ণয় করে ফেলে ও জানতে চায় আমরা বিয়োজনে প্রস্তুত কিনা। বললাম, আমরা প্রস্তুত। 'বাঁধ' খুলে ফেলার আগে 'অ্যাপলোর' চালকদল শেষবারের মত আবার জানাল মহাকাশযান বিয়োজনের জন্যে প্রস্তুত।

আমাদের মহাকাশযান দুটি ধীরে ধীরে সরে পড়ল।

মার্কিন মহাকাশচররা সরে গিয়ে আমাদের মহাকাশযানের ছবি তুলল — এই ছবিগুলির সাহায্যেই বিজ্ঞানীরা পরে গবেষণা করেন আমাদের মহাকাশযানের অন্ধকারাচ্ছন্নতার মাত্রা। রিঅ্যাক্টিভ পরিচালন-যন্ত্রের এঞ্জিন চালু করে দিয়ে 'অ্যাপলো' শুরু করল 'কৃত্রিম সূর্যগ্রহণ' নামক গবেষণা।

সে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য! ভালেরি আর আমার ভয় ছিল, 'অ্যাপলোর' এঞ্জিন থেকে বেরিয়ে আসা শিখা সূর্যগ্রহণের দৃশ্যটি একেবারে মাটি করে দিতে পারে। আমি তখনও জানতাম না সূর্যগ্রহণের সময় তোলা আমাদের ছবিগুলো কেমন হবে। আমার সামনে উদ্ভাসিত রঙগুলি ছিল এতই অপরূপ আর অকল্পনীয় যে তা আর বলার নয়। সে রঙ আমার কল্পনাকে করেছে পরাহত। তাই বাড়িতে ফিরেই আমি সমস্তকিছু আঁকতে বসলাম।

আমাদের মহাকাশযানগুলির মধ্যে দূরত্ব যখন প্রায় ২২০ মিটার, 'অ্যাপলো' গতিরোধের এঞ্জিনটি চালাল। মহাকাশযান দুটি আবার তৈরি হল মিলনের জন্যে — সক্রিয় মহাকাশযানের ভূমিকা এবার 'সয়ুজের', আর 'অ্যাপলো' ছিল অক্রিয়।

বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটের সময় সংযোজন সম্পন্ন হয়। তবে দ্বিতীয় সংযোজনের পরে মহাকাশচরদের নতুন কোন সাক্ষাতের কথা ছিল না। সন্ধে ৬টা ২৬ মিনিটের সময় শেষবারের মত পরস্পরকে আমরা বিদায় জানাই।

বিদায় 'অ্যাপলো', বিদায় আমাদের আমেরিকান বন্ধুরা — টম স্ট্যাফোর্ড, ডিক স্লেইটন, ভান্স ব্রান্ড! পৃথিবীতে, আমাদের সবার মাতৃভূমি ও সবার বাড়ি সেই অপূর্ব নীল পৃথিবীতে আবার দেখা হবে!

মস্কো সময় রাত ১১টার দিকে 'অ্যাপলো' কক্ষপথ ছেড়ে দিল। ফলে 'সয়ুজের' সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ার ভয় আর থাকল না। আর তারপর শিগগিরই সে চলে গেল আমাদের দৃষ্টির অগোচরে।

'অ্যাপলোর' সঙ্গে বিচ্ছেদের পর পুরো একটি দিন আমরা ব্যস্ত থাকি কয়েকটি জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় — বিজ্ঞানীরা আমাদের কাছ থেকে অপেক্ষা করছেন যত বেশি সম্ভব তথ্য। তুলি সূর্যোদয়ের ছবি — তা কাজে লাগবে আবহ- আর আলোক-বিজ্ঞানীদের।

উপসংহার

প্রিয় কিশোর বন্ধু ! গল্প এবার শেষ। তোমাকে দেখালাম 'সয়ুজ'-'অ্যাপলো' মহাকাশ অভিযানের কয়েকটি ছবি। মহাকাশ বিজয়ে বিভিন্ন দেশের নতুন আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সূচনা করল এই অভিযান। কাটবে আরও কিছুকাল, গ্রহ-নক্ষত্রে যাবে নতুন-নতুন মহাকাশযান, মানুষের মঙ্গলে তা পরিচালনা করবে নতুন-নতুন লোক। হয়তো এরূপ একটি মহাকাশযানে বসে তুমিও একদিন পাড়ি জমাবে মহাশূন্যে। সারা হৃদয় দিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তোমার জন্যে কামনা করছি অনেক অনেক সাফল্য।

প্রিয় বন্ধু, যাত্রা তোমার শুভ হোক!